অহিংসার ইউটোপিয়া

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

সন্ত্রাস অর্থে ভয়, রাষ্ট্র মানে আইন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানে আইনী সন্ত্রাস। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি কাশ্মীরে, মণিপুরে, নন্দীগ্রামে বা আমাদের দৈনন্দিন রাষ্ট্রয়ন্ত্র যাপনে। তবে, একথা ঠিক নয় যে, রাষ্ট্র জন্মাবার আগে সন্ত্রাস ছিলনা। ছিল, তবে তার আইনী শিলমোহর ছিল না। অপরাধীর ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াড এত ঈশ্বরীয় যৌক্তিকতায় হাজির ছিল না। যে বা যারা সন্ত্রাস চালাত, হয়তো কোনো অদিবাসী গোষ্ঠী, অন্য কোনো গোষ্ঠীর মানুষদের ওপর, থাকত কিছু এক পার্থিব লোভ— জমি, খাদ্য, নারী। যতদূর পর্যন্তই পিছিয়ে যাই না কেন, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের গল্প নেই, ইতিহাসে, প্রাক - ইতিহাসেও। গোষ্ঠী বনাম দল— পৃথিবী জুড়ে থাকা জঙ্গলে সেই আক্রমণ - প্রতিআক্রমণ, সন্ত্রাস - পাল্টা সন্ত্রাস, প্রতিরক্ষা - প্রতিশোধ ক্রমে বিবর্তিত হয়ে, দুর্বলের ওপর সবলের আগ্রাসন প্রতিষ্ঠা পেয়ে জন্মেছে রাষ্ট্র। তাই বলে পৃথিবীটা তো আর একটি রাষ্ট্র হয়ে যায়নি, অতএব, রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধে ঘটে গেছে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ এমনকী বিশ্বযুদ্ধ। আপাত যুদ্ধহীন ঠাণ্ডা পর্বেও এক রাষ্ট্র চালিয়ে যায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসের কারবার। এই প্রক্রিয়া পারস্পরিক, অন্তহীন। বস্তুতঃ বাহ্য সন্ত্রাস প্রকাশ করে মানুষের গহনে বাস করা অচেনা সন্ত্রাসকে, কেননা, যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে সে তো নিজেও সন্ত্রস্ত!

রাষ্ট্রের সত্তা বা রাষ্ট্রসত্তা

তো, রাষ্ট্রের কি সচেতন অস্তিত্ব আছে? রাষ্ট্র কি তার অবচেতনে বহন করে, আমার আপনার মতোই সেই আদি শঙ্কা—মৃত্যুভয়? নিয়তই কি তার যুক্তিপূর্ণ মননে চকিত ছায়া ফেলে যায় ব্যাখ্যাতীত ভয়!

কেউ কেউ বলেন, রাষ্ট্র একটি যন্ত্র, যার আবেগ ভয় ভালবাসা কিচ্ছু নেই, যার কাজই হল সবাইকে ঐ যন্ত্রের উপযোগী উপাদানে পরিণত করা। এদের যুক্তিশৃঙ্খলা প্রাচীন পদার্থবিদ্যার মতো, যা ভেবেছিল এই বিশ্ব চলে একটি যান্ত্রিক নিয়মে, এমনকী মানুষও সেই নিয়মেরই অধীন। কেউ বা ভেবেছে, রাষ্ট্র হল ঈশ্বরপ্রতিম, মানুষে মানুষে নানা দ্বন্দ্ব নিরসনে যার জন্ম স্বয়ং ঈশ্বরেরই হাতে। যেমনটিই ভাবা হোক না কেন, মোদ্দা কথাটি ছিল, রাষ্ট্র কোনো সচেতন সত্তা নয়। হয় যে যন্ত্রদানব, নয় কোনো মানবাতীত। তাহলে সেই রাষ্ট্র তার অন্দরে - বাহিরে সন্ত্রাস চালায় কেন? উত্তরে এসেছে— ইহাই রাষ্ট্রতন্ত্র বা ঈশ্বরের বিধান।

রাষ্ট্রকে তন্ত্র তথা কাঠামো, যা ব্যক্তি - নিরপেক্ষ, ভেবে নিলে এবং সেই মতো শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গলাধঃকরণ করালে রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আর কোনো ব্যক্তিগত মানবিক দায় থাকেনা। তাদের নির্দেশে সংঘটিত চূড়ান্ত অমানবিক, অনৈতিক কাজও রাষ্ট্র নামক নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। যে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালায়, তাও সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনে, আবার, যে কমিউনিস্ট অজস্র মানুষকে শ্রমশিবিরে বা ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠায়, সেই একই রাষ্ট্রের দরকারে। ব্যক্তিমানুষের আর কোনো দায়ভাগ থাকেনা। 'কী করবো? এমনটা হোক আমি চাইনি। তবু রাষ্ট্র তথা দেশ তথা আইনের শাসন বাঁচাতে এমনটা করতে হল!' —এমন বাক্য আমরা অহরহই রাষ্ট্রের কুচো - কাৎলা ক্ষমতাধারীদের মুখে শুনি নাই কি!

মার্কসবাদ এবং রাষ্ট্র

তিনি, কার্ল মার্কস, বলেন—রাষ্ট্র ঈশ্বরতুল্য নয়, কোনো যন্ত্রও নয়, যার কাছে মানুষ অসহায় শিকার। বরং তিনিই বলেন, রাষ্ট্র এমন এক যন্ত্র যার যন্ত্রী হল মানুষ। যখন যে সেই যন্ত্রীর আসনে বসার সুযোগ পায়, তেমন তার সুবিধানুযায়ী যন্ত্র চালায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চালক পুঁজির মালিক, অতএব, তারা তো তাদের শাসনজারি রাখতেই রাষ্ট্র চালাবে। আর রাষ্ট্র চালানোর জন্য দুটো অস্ত্র—পারসুয়েশন এবং কোয়ারশন। জনগণের কাছে ক্রমাগত শাসনের বৈধতা জোর করে দমন। মার্কস রাষ্ট্রের নির্বিকল্প নিরাকার নিরপেক্ষ ভণ্ডামিটা ফাঁস করে দিলেন। এবং তিনি এও বললেন যে, যতদিন পৃথিবীতে রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন শোষণ, দমন থাকবে। তাই রাষ্ট্রহীন পৃথিবীই হল লড়াই -এর লক্ষ্য।

এলেন লেনিন, বললেন এবং করলেন—পৃথিবী থেকে চিরতরে রাষ্ট্রকে বিদেয় করার জন্য আপাতত রাষ্ট্রটাকে দখল করা দরকার। তো, কে দখল করবে? শ্রমিক। এতদিন পুঁজির মালিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, বিপ্লব করতে হবে, যুদ্ধ, পুঁজিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস, এবার রাষ্ট্রক্ষমতার দখল মেবে পুঁজির অপর, শ্রম, শ্রমের মালিক, শ্রমিক। এমনতর রাষ্ট্রটির নাম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবে, শ্রমিকরা তো আর নিজেরা সংগঠিত হয়ে এতবড় একটা ব্যাপার, বিপ্লব, করতে পারবেনা, অতএব, তৈরী হল কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কারা থাকবে সেই কমিউনিস্ট পার্টিতে, যে কেউ, শুধু তাকে এই পথ ও মতে বিশ্বাসী হতে হবে। লেনিন ছিলেন মার্কসবাদী, তিনি জানতেন সুন্দর সবল একটি বা একাধিক রাষ্ট্র তৈরী করা মার্কসবাদীর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য নৈরাষ্ট্র। তবু অন্তর্বর্তীকালে, ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এই সমাজতন্ত্র তথা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি ধাপ মাত্র, যার কাজ জনগণকে ঐ লক্ষ্যপূরণের উপযোগী করো তোলা।

কিন্তু মার্কসবাদী রাষ্ট্র কি তার অন্দরে বাহিরে সন্ত্রাস চালাবে না? অবশ্যই চালাবে, কেননা, যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে পুঁজিবাদের সমর্থকরা রাষ্ট্রটিকে কব্জা করে নিতে পারে; অতএব সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলেই রাষ্ট্রের বল প্রয়োগ করতে হবে।

উপরোক্ত যুক্তিকাঠামো মেনেই তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধাররা তাদের দেশের অভ্যন্তরে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে। সবসময় তারা ত্রস্ত থেকেছে—এই বুঝি কেউ তাদের ধ্বংস করবে। কাছে দূরে সব জায়গায় শত্রুর ভূত তাড়া করেছে তাদের, আর, অন্য কোনো হেনবাদী তেনবাদী রাষ্ট্রের মতোই গুপ্তচরবাহিনী, গোপন ঘাতকের দল এবং প্রকাশ্য সৈন্য সমারোহে নাশ করতে চেয়েছে সেই ভূতকে।

যাই হোক, রাষ্ট্র সন্ত্রাস করবে এবং করছেনা বলে ঘোষণা করবে, সন্ত্রাসের খবর চেপে দিতে চাইবে, একান্তই না পারলে রাষ্ট্রহিতের অজুহাত দেখাবে—এ ঘটনা, ঘটনার পর ঘটনা, মার্কসবাদীদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই, কট্টর মার্কসপন্থীরা 'রাষ্ট্র কেন সন্ত্রাস চালাচ্ছে' বলে কাঁদেনা, আবার, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে সন্ত্রাস চালিয়েছে তার জন্য অনুতপ্তও নয়।

রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট পার্টি

সমাজতান্ত্রিক দেশে দেশে বিংশ শতাব্দী জুড়ে অতএব কায়েম হল শ্রমিক শাসন। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের বকলমে তাদের ভ্যানগার্ড কমিউনিস্ট পার্টির শাসন। সেখানে অন্য কোনো পার্টি নেই। এমনকী শ্রমিকরাও ইচ্ছে করলে আরও একটি কমিউনিস্ট পার্টি খুলতে

পারেনা। রাষ্ট্রের সর্বত্র —আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক—স্থাপিত হল পার্টির একাধিপত্য। কোন কারখানায় কতটা পরিমাণে কী তৈরী হবে, তা কোথায় যাবে, কী দামে যাবে; চাষী নিজভূমে চাষ করবে, না সবাই মিলে যৌথখামার বানাবে, সেই খামারে কী চাষ কোন পদ্ধতিতে হবে, কোন কোন জিনিস কী দামে কার সঙ্গে আমদামি - রপ্তানি হবে—ঠিক করবে পার্টি। এক একটা কারখানা বা খামারের প্রতিনিধি কে বা কারা হবে, সুপ্রিম সোভিয়েতে কারা আসবে, কোনটা প্রগতিবাদী সংস্কৃতি আর কী-ই-বা প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মাচরণ ভাল না মন্দ, কতটা ভাল কতটা খারাপ—সব বিচার পার্টির। বিচারসভায় সব পার্টিনিযুক্ত বিচারকবৃন্দ। সমাজের মাথারাও সব পার্টিরই লোক। শিক্ষাক্রম স্থির করবে পার্টি। শিক্ষকও নিয়োগ করবে তারা। পরিবারে ঝামেলা বাঁধলে, মেটাতে সেই পার্টি। জন্মাতে পার্টি, মৃত্যুতেও।

দেশ ও জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এভাবে রাষ্ট্রর তথা পার্টির উপস্থিতি পূর্বতন কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় হয়নি। রাষ্ট্র এত মজবুত, এত সর্বশক্তিমান, এত মাইক্রো, এত আশরীরি আগে কখনো হতে পারেনি।

পার্টির প্রতিটি সদস্য - সমর্থক রাষ্ট্রের হয়ে নজরদারি চালাচ্ছে, সাধারণ, পার্টির বাইরের মানুষও যেচে রাষ্ট্রের কাছে কল্পিত চক্রান্তের খবর পৌঁছে দিচ্ছে— কৃপাপ্রার্থনায়। খাওয়ার টেবিল, শোয়ার ঘর এমনকী টয়লেটেও মানুষ পার্টির সমালোচনা করতে ভয় পাচ্ছে—কখন কে যে সে খবর পৌঁছে দেবে!

কলেজ - ইউনিভার্সিটির ছাত্র কমরেডদের ডাকা আলোচনা চক্রে কে কে গেলনা— তালিকা তৈরী কর, ফাইল, নজরদারি। একই অবস্থা পাড়ায়, কর্মস্থলে, পরিবারে। সন্দেহ হলেই নিখোঁজ। কিম্বা অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত, পথপার্শ্বে প্রাপ্ত লাশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লভিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি—সমগ্র মার্কসবাদী দুনিয়ার বাইরে কেউ যেতে চেষ্টা করলেও মৃত্যু।

ইতিমধ্যে পার্টি হয়েছে চূড়ান্ত পিরামিড সদৃশ, পেটোয়া ধান্দাবাজ আর চক্রান্তকারীদের আখড়া। কোনো না কোনো মহান নেতার নামে দেশে দেশে চলেছে ব্যক্তিপূজা। তাঁর কোনো সমালোচনা করা যাবেনা। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বর স্বপ্ন পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়েছে হিংস্র রাজতন্ত্রে। অনেক মার্কসবাদীও শ্রমশিবিরে চালান গেছেন বা গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। বিচারের প্রহসনেও প্রাণদণ্ড হয়েছে অনেক বাঘা বিপ্লবীর। কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তি পূজার বিরোধিতা করতে গিয়ে। একনায়ক এবং তাঁর চ্যালারা সবসময় এত সন্ত্রস্ত থেকেছে, যে, পার্টির একটা বড় অংশকে নিজেরাই নিকেশ করেছে। কতবার, কত না হাজার বার পার্টিকর্মী গ্রেপ্তার হয়ে বলেছে,, কমরেড, ভুল হচ্ছে। উত্তর এসেছে, পার্টি কখনো ভুল করতে পারেনা।

আংশিক রাষ্ট্রক্ষমতায় পার্টি

যাঁরা ভাবছেন, ব্যাঙ্গের হাসি নিয়ে, যে, এসবই বুর্জোয়াদের কুৎসা এবং বর্তমান লেখকও সেই কুৎসাকারীদের দালাল, তাঁদের বলি—মতাদর্শের চশমাটা খুলে চারপাশে তাকান, বুঝতে পারবেন মার্কসবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নমুনা। সাধারণত পৃথিবীব্যাপী মার্কসবাদীদের মতোই আমাদের বাংলার মার্কসবাদীরাও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উপরোক্ত ভয়াবহতাকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। একদল ভেবেছেন, যতটা প্রচার ততটা ঘটেনি, তবে কিছু কিছু তো ঘটেছেই, নেতৃত্বের দুর্বলতাই তার কারণ, এর সঙ্গে অন্দরে - বাহিরে পুঁজিবাদী পৃথিবীর চক্রান্ত তো ছিলই। আর এক দল, যাঁরা মনে করেছেন, কমরেড অমুকের পর থেকেই ও দেশটা আর মার্কসবাদী ছিলনা, অতএব, ওসব ঘটনার দায় মার্কসবাদী শিবির নেবে না। সবচেয়ে আশাবাদী মার্কসপন্থীরা আবার ঐ ঘটনাকে ভুল হিসেবে স্বীকার করেও মনে করেন, পৃথিবীর কোথাও কখনও মার্কসবাদী শাসন প্রকৃতপক্ষে কায়েমই হয়নি, যা হয়েছে সবই বিকৃতি, অতএব দায় পার্টির নয়, কেননা শুদ্ধতম পার্টি তো এখনও তৈরীই হয়নি। এঁরা এখনও বিশুদ্ধ এক মার্কসবাদী পার্টির অলীক কল্পনায় মহাকাশের দিকে চেয়ে—কবে নেমে আসবে অবতার বা দেবদূত, হাতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো!

ওসব ঐতিহাসিক তথ্য - তত্ত্বের অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক ছেড়ে আমরা যদি ঘরের কাছেই বামশাসনের দিকে তাকাই, তাহলেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, পার্টির সন্ত্রাসের মাত্রার ভয়াবহতা দর্শন করব। গত তিরিশ বছর এই রাজ্যে চলছে বামশাসন। পাড়া, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত, সংস্কৃতি জগৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, উন্নয়নী কর্মসূচী, কর্মস্থল—এককথায় সর্বত্র পার্টিই ঠিক করে দেয় সব। তবু, এ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, আমরা খুবই ভাগ্যবান যে দেশটা চীন বা রাশিয়া নয়, এখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র আছে, আপাত স্বাধীন বিচারব্যবস্থা আছে, আছে গণমাধ্যম। এত সব ব্যবস্থাপনার মধ্যেও শাসক মার্কসপন্থীরা যেভাবে পুলিশ - প্রশাসনকে পার্টির শাখা সংগঠনে পরিণত করে জনগণের ওপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে, চালায়—ভাবতেও ভয় হয়, যে, যদি আইনতই আর কোনো পার্টি না থাকত, সব মিডিয়াই পার্টির হ'ত, বিচারক - উকিল সবই পার্টির, আমাদের যদি মিছিল - মিটিং - বিক্ষোভ করারও অধিকার না থাকত, কী ভয়ঙ্কর যাপন হত! এই যে, 'সেজ'—এর বিরুদ্ধে এত লড়াই, তার কিছু ফললাভ হচ্ছে, চীনেও হয়েছিল, স্রেফ লাঠি - গুলি দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। জনগণের কথায় কান দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করেনি পার্টি। কেননা, জনগণের কীসে ভাল হয়, তা পার্টিই একমাত্র বোঝে। আর পার্টি কখনও ভুল বা অন্যায় করতে পারেনা। শুধু আরও একটু গণতান্ত্রিক অধিকার চেয়েছিল বলে তিয়েন আন - মেন চত্বরে হাজার হাজার ছাত্রের ওপর ট্যাঙ্ক চালিয়েছিল পার্টি। কখনও ভাবতে পারেন, কলকাতা বা দিল্লীতে অমন ঘটছে?

এরপরও যাঁরা পার্টিজান, ভাবছেন, ওগুলো সব অধঃপতিত, প্রকৃতটি বাড়ছে গোকুলে, তাকান একবার আপন পার্টিটির অন্দরে। কী ভয়ানক গোষ্ঠীবাজি, পদের লড়াই, চক্রান্তে ছড়ানো জাল এবং দমন। হুমকি, কুৎসা, ষড়যন্ত্র আর ক্ষমতার লোভ— ঢাকা দেয়ার জন্য বড় বড় আন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বের বুকনি, চূড়ান্ত অ-গণতন্ত্র— এই হচ্ছে যাবতীয় ছোট মার্কসবাদী পার্টির অভ্যন্তর।

রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রক্ষতায় থাকা পার্টিগুলোর এহেন রূপ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দেয় তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বরূপকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ত্রাস এমন ভয়ানকভাবে কখনো আসেনি মানবজমিনে আগে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে জনগণ

রাষ্ট্র থাকলেই রাষ্ট্রীয় দমন থাকবে। এটাই যদি ভবিতব্য হয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ কী করতে পারে?

মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলোতে সরকারি তথা পার্টির সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার মতো কোনো পথই মানুষের সামনে খোলা ছিলনা, এখনও নেই। তবে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে দীর্ঘকাল যে ক্ষমতা ধরে রাখা যায়না, ঐসব রাষ্ট্রের পরিণতিই তার প্রমাণ। মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে প্রকাশ করার জায়গা দিতে হয়। যে রাষ্ট্র যত বেশী ভীত, সে ততই ভয় পাওয়ানোর রাস্তায় চলে। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণী তথা পার্টির নাম করে যারা ওসব দেশে একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বা আছে, তারা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত। সেই আতঙ্ক এমনই অলৌকিক হয়ে ওঠে যে চারদিকে কাছে দূরে তারা চক্রান্তর গন্ধ পায়। সেই আত্মপচনের দুর্গন্ধ দূর করতে চলে সাফাই অভিযান। ঠিক যেন শুচিবাইগ্রস্থ বিধবা, সারাদিন ধুয়ে চলেছে সবকিছু।

অন্যদিকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যথা ভারতবর্ষ, যার ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে দরিদ্র ছাড়া আর সব শ্রেণী, সেও আতঙ্কিত। এই যে দিব্যি করেকম্মে খাচ্ছে, হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায়! ফলে, সেখানেই ক্ষমতাবানদের স্বার্থে আঘাত লাগার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়, নেমে আসে সন্ত্রাস। তবে মার্কসবাদী পাটিতন্ত্রের সঙ্গে বিশাল গুণগত পার্থক্য তৈরী করে দেয় এখানে রাষ্ট্র নিজেই। মানুষ অভিযোগ জানাতে পারে, বিচরালয়ে যেতে পারে, আন্দোলন করতে পারে, মিডিয়ায় সন্ত্রাসের খবর দেখাতে পারে—এককথায় এখানেও সন্ত্রাস আছে, কিন্তু একেশ্বরবাদ না থাকায় প্রতিবাদের রাস্তা আছে। সাম্প্রতিক নন্দীগ্রামের ঘটনা গণতান্ত্রিক ভারতের সাফল্য, যা তথাকথিত সমাজতন্ত্রে অকল্পনীয়।

তবু, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থাকে, আবার যা রাষ্ট্রের সীমা ভেঙে সাম্রাজ্যবাদ রূপে সারা পৃথিবীই দখল করতে চায়। এ হল সবলের সন্ত্রাস, আইনী। অতএব তার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় দুর্বলের সন্ত্রাস, যা বেআইনী, অর্থাৎ, গোপন। রাষ্ট্র সদর্পে তার সেনাবাহিনী পাঠায়, প্রকাশ্যে, পৃথিবীর জনমতের তোয়াক্কা না করেই। বিপরীতে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রঘাতক সন্ত্রাস, গোপনে, জনভিত্তিতে বলীয়ান। কত সন্ত্রাসবাদী মারবে রাষ্ট্র? সন্ত্রাসবাদী মারলে সন্ত্রাস মরেনা, ঠিক যেমন রাষ্ট্রনায়ক নিহত হলেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কমেনা।

গোড়ার কথা

সন্ত্রাসের অর্থ সম্যক রূপে ত্রাস। প্রতিটি প্রাণের রয়েছে ভয়, মৌল ভয়,—মৃত্যু। সেই ত্রাস থেকে বাঁচতেই সে আশ্রয় নেয় পাল্টা ত্রাসের। মৃত্যুকে, নশ্বরতাকে যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বলে মেনে নিতে পারেনা, সে ত্রাসগ্রস্ত হয়ে ততই ছড়ায় সন্ত্রাস। মৃত্যু—এই সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে, সব—অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা এমনকী শরীর, মানতে পারেনা মানুষ। ভাবে, এমন সব কীর্তি স্থান করে যাব, যা তাকে করবে অমর। তার শরীর মরে গেলেও স্মৃতি রয়ে যাবে— অক্ষয়, অমর। আলেকজান্দার দ্য গ্রেট। অতএব বিস্তার, ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতিই অমরত্বের চাবিকাঠি। কেউ গান গায়, ছবি আঁকে, লেখে, আশায় যে মৃত্যুর পর ক্ষমতার ক্রমবিস্তার, দিগ্বিজয়ী বীর রূপে ইতিহাসে নাম খোদাই করতে চায়।

প্রথমোক্ত মানুষদের অমরত্ব কামনা কারো ক্ষতি করেনা। দ্বিতীয় ধরণের লোকেরা তাদের কীর্তিপথে পিষে যায় অসংখ্য অন্য মানুষ, তাদের বাসভূমি এবং ছোট ছোট স্বপ্ন। এই বীর রূপে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে টিকিয়ে রেখেছে সন্ত্রাসের ঘরানা। বীরদের অভিযানে যাদের লাভ হয়েচে, তারাই রচনা করেছে বীরগাথা, ইতিহাস, প্রবাদ—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর, মহাবীর, মহা মহাবীর পুজোর সংস্কৃতির মাধ্যমেই ছড়াচ্ছে বীর হয়ে ওঠার আকাঙ্খা। ইতিহাসের যোদ্ধাদের যদি আমরা উপেক্ষা করতে না শিখি, তাহলে কোনোদিনই কমবে না সন্ত্রাসের সংস্কৃতি। আর ক্ষমতাবান তথা সবলের সন্ত্রাস জন্ম দিয়েই চলবে পাল্টা সন্ত্রাস, দুর্বলের গোপন সন্ত্রাস।

শেষ কথা নয়

সন্ত্রাস, তা সে সরকারি-বেসরকারি, দলবদ্ধ-ব্যক্তিগত—যেমনই হোক না কেন, আমাদের হতবাক করে তার হিংস্রতার প্রদর্শনে। গুলি খাওয়া লাশ, বোমায় ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আহত শিশু - বৃদ্ধ - মহিলার রক্তস্নাত অচেতন শরীর, ধর্ষিতা মহিলার শূন্য দৃষ্টি— আমাদের বাকরুদ্ধ করে। আমরা, যারা এখনও সন্ত্রাসের শিকার হইনি, প্রশ্ন করি, কেন এমন করে মানুষ? কী করে এতটা নৃশংস হতে পারে স্বজাতীয় জীব? এত নাকি এগিয়েছে সভ্যতা, যুক্তির হাত ধরে সারা বিশ্বেই নাকি ছড়িয়ে পড়েছে জ্ঞানের আলো। তারপর, তার পরও এসব যুদ্ধাভিযান, হত্যালীলা, ধ্বংসোন্মত্ততা এই পৃথিবীর বুকে, মানুষেরই হাতে! আর যারা সন্ত্রাসের শিকার, তারা কি এত দূরত্ব রেখে দেখতে পারে ঘটমান সন্ত্রাসকে? ইরাক, প্যালেস্থাইন, কাশ্মীর, মণিপুর, নন্দীগ্রামের মানুষ পারে কি সন্ত্রাস নিয়ে তথ্য - তত্ত্বের কচকচি মারাতে? আমরা হলেও কি পারতাম, বাবা-ভাই নিহত হলে, মা-বোন-বৌ ধর্ষিতা হলে শান্তির বাণী ছড়াতে?

এই হিংসা—যা হিংস্রতার রূপেই প্রকাশিত হবে এমন নয়, নন-ভায়োলেন্ট হিংসে— যার লালন করি আমরাই, বহন করি রক্তস্রোতে—প্রকৃতপক্ষে জীবের সাধারণ ধর্ম। অতএব হিংসে—পাল্টা হিংসে, আক্রমণ-প্রতিশোধ, সন্ত্রাস-বদলি সন্ত্রাস চলছে, চলছে, হয়তো চলবেও। আমরা, মানুষরা, ভাগ হয়ে যাব পক্ষে-বিপক্ষে, বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও বড় বড় মানবিক বাতেলা মারব। কেননা, স্মৃতি, ভূত, অতীত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। যতক্ষণ না স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে, আমরা অহিংস হয়ে যেতে পারিনা। যতই রবিবাবু মানুষের ধর্মের জয়গান করুন, জীবধর্মকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারিনা। কাতারে কাতারে মহাপুরুষ, ধর্মগুরু, সাহিত্যিক, নেতা, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক কত হাজার বছরের চেষ্টাতেও পৃথিবীতে অহিংসা তথা অ-হিংস্রতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারেননি। তবু, ইউটোপিয়া মরেনা, অহিংস, শান্তিময় মানবসমাজের ইউটোপিয়া তবু বেঁচে থাকে, বয়ে চলে ক্ষীণধারায়, কখনো প্রধান স্রোতস্বিনী হবে এই স্বপ্নের, আশায়।